

# এও এক কঠিন প্রতিযোগিতা

জহর সরকার

গত বছর ইউনেস্কো, অর্থাৎ রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা, কলকাতার দুর্গাপুজোকে বিশাল সম্মানে ভূষিত করেছে। আমাদের শারদীয় উৎসব হল একটি ‘ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি’, মানে মানবজাতির এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই প্রথম বার কলকাতার কোনও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এত বড় বিশ্বব্যাপী সম্মান পেয়েছে, অতএব মহানগরীর উৎফুল্ল হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ‘কিন্তু এতে রাজ্য সরকার এত উল্লসিত কেন, প্রস্তাবটি তো তৈরি করেছিলেন দক্ষ বিশেষজ্ঞরা?’— যাঁরা এই ধরনের হিংসুটে প্রশ্ন তুলছেন, তাঁরা জানেন না যে এর আগে কোনও রাজ্য সরকার এই সব বিষয়ে কোনও উৎসাহই দেখাত না। তাই শান্তিনিকেতনকেও বিশ্বসম্মান দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। আমাদের ছৌ নৃত্য যখন ২০১০-এ ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছিল তখন কেউ জানতেই পারেনি, কেননা রাজ্যে কোনও প্রচারই হয়নি। ছৌ নিয়ে কিন্ন ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড মেতে উঠেছিল।

এই বিশ্ব ঐতিহ্য সম্মান বিষয়টি আর একটু গভীরে দেখা যাক। ইউনেস্কোর একটি চিহ্নিত কাজই হল বিভিন্ন দেশকে তাদের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক সম্পদ তুলে ধরতে সাহায্য করা। আর তাদের স্থাবর-অস্থাবর ঐতিহ্যের কথা সারা বিশ্বের দরবারে প্রচার করা। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বলতে আমরা প্রথম শ্রেণির স্থাবর (ট্যানজিবল) স্থাপত্যকলা বুঝি। যেমন প্যারিসের আইফেল টাওয়ার বা আগরার তাজমহল, এমনকি অজন্তার অতুলনীয় গুহার চিত্রকলা। এই বিভাগে প্রাকৃতিক বিষয়কেও ধরা হয়, যেমন সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, যা ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশেও, এবং এই বিশ্ব ঐতিহ্য সম্মানের আমরা দুই দেশ যুগ্ম অধিকারী। আর একটি পৃথক শ্রেণি ‘অস্থাবর (ইনট্যানজিবল) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’, যার মধ্যে আছে সাহিত্য, গান, নাচ, নাটক, অন্যান্য কলা। এই শ্রেণিতেই ছৌ ও দুর্গাপুজো স্থান পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে যে সাংস্কৃতিক রঙ্গভান্ডার আছে তার এক ক্ষুদ্র অংশও আমরা বিশ্বের দরবারে দেখাতে সক্ষম হইনি। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকে অনেকেই বিষয়টির

গুরুত্ব বুঝতে পারেন না, সময় নষ্ট করেন, আর তার মধ্যে অনেক সচিবের মেয়াদই ফুরিয়ে যায়। রাজ্যগুলির মধ্যে তাঁরা প্রচার করতে বা উৎসাহ ছড়াতে পারেন না। খুব কম রাজ্য আছে যেখানে এ নিয়ে আদৌ কোনও জ্ঞান বা উদ্দীপনা আছে। দেশের সংস্কৃতি সচিব হিসাবে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের কাজে আমার এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা।

ট্যানজিবল বা স্থাবর শ্রেণিতে ইউনেস্কো ভারতের ৪০টি এলাকাকে বিশ্বমানের ‘সাইট’ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে ৭টি অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক এলাকায় আছে সুন্দরবন, মানস, কাজিরাঙা ইত্যাদি। এই উপবিভাগে পশ্চিমবঙ্গের দাবিদার কালিম্পাঙের নেওড়া উপত্যকার জাতীয় পার্ক, অনেক দিন ধরে ‘ওয়েটিং লিস্ট’-এ অপেক্ষারত। রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে চাপ দিলে হয়তো প্রস্তাবটি এগোতে পারে। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সব প্রস্তাব থেকে বাছাই করে মাত্র দু’টি পাঠাতে পারে প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দফতরে।

ভারতের ৩৩টি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থলের স্বীকৃতি পাওয়া এলাকার মধ্যে আমাদের ভাগে পড়েছে একেরও কম। তিনটি পাহাড়ি রেল, কালকা-শিমলা রেলপথ, নীলগিরি পার্বত্য রেল আর দার্জিলিঙের টয়ট্রেনকে ‘এক’ বলে গণ্য করে ইউনেস্কো যে যৌথ সম্মান দিয়েছে, তার এক-তৃতীয়াংশের আমরা ভাগীদার। ভারতের বাকি ৩২টি বিশ্বপরিচিত ঐতিহাসিক অঞ্চল বা স্থাপত্যের মধ্যে আমাদের একটিও নেই। তা হলে আমরা দেশের সাংস্কৃতিক জগতে নিজেদের সর্বোচ্চ বলি কী করে? ঠিকই, প্রাচীন যুগের গর্ব করার মতো ঐতিহাসিক অঞ্চল বা স্থাপত্যকলার নিদর্শনের বেশির ভাগই বাংলাদেশে, যেমন মহাস্থানগড়ের বৌদ্ধ বিহার, জগদল বিহার বা লালমাই ময়নামতীর স্থাপত্য। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল চন্দ্রকেতুগড়কে নিয়ে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রককে কিছুতেই উৎসাহিত করা যায়নি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিরাট টিম নিয়ে বহু বছর ধরে খনন করলে তবেই এই স্থানের আসল রহস্য বার করা যাবে। চন্দ্রকেতুগড়ের সাফল্য পূর্ব ভারত তথা উপমহাদেশের ইতিহাস পাল্টে দিতে পারে। কিন্তু সে কাজ করবে কে?

আরও কয়েকটি প্রাচীন এলাকার মধ্যে বিষ্ণুপুর নিয়ে প্রচুর তথ্য আর যুক্তির সঙ্গে ভারত সরকার প্রস্তাব জমা করেছে প্যারিসের অফিসে, সেই ১৯৮৮-তে। বাংলা সারা

পৃথিবীকে গর্ব করে দেখাতে পারে এই ঐতিহাসিক শহরের পোড়ামাটির ভাস্কর্য আর মন্দিরের অলঙ্করণ। আমাদের ক্ষুদ্র কুটিরকে ভিত্তি করে যে কত সুন্দর স্থাপত্য সৃষ্টি করা যায় প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলার সুলতান ও রাজারা, কিন্তু এটি ৩৪ বছর ধরে ইউনেস্কোর ‘সম্ভাব্য তালিকা’য় পড়ে আছে। সব কাজ আবার নতুন পদ্ধতিতে না তৈরি করতে পারলে কেউ অত পুরনো প্রস্তাব ছুঁয়েও দেখবে বলে মনে হয় না। আর গৌড়-পাণ্ডুয়া নিয়ে প্রস্তাব তো তৈরিই হয়নি। যাঁরা প্রশ্ন করেন মুখ্যমন্ত্রীর কী ভূমিকা, তাঁদের জানা ভাল যে, কেন্দ্রে মন্ত্রী-সচিবদের মেয়াদ সাধারণত এক-দুই বছরের বেশি হয় না। মন্ত্রকের জটিলতা আর সম্ভাব্য কাজ বুঝে নিতে না নিতেই তাঁদের বদলি বা ছুটি হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীদের মেয়াদ সাধারণত অনেক বেশি হয়, অতএব তাঁরা দূরদৃষ্টি দেখিয়ে পরিকল্পনা করতে পারেন। কোনও ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক এলাকার বিশ্বসম্মান জুটলে, অথবা তাঁদের রাজ্যের যে কোনও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (যেমন কলকাতার দুর্গাপূজা) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলে তাকে দেখভালের দায়িত্ব রাজ্যের উপরই ন্যস্ত হয়। দেশবিদেশ থেকে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ে। সেই দায়িত্বও আসে রাজ্য সরকার আর পুরসভার উপর, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নয়। সত্যি কথা বলতে, পশ্চিমবঙ্গের ইউনেস্কো স্বীকৃত স্থান অথবা সম্মানিত অনুষ্ঠান-প্রথা এত কম কেন বুঝতে গেলে দেখতে হবে তৎকালীন রাজ্য সরকার কতখানি উৎসাহ দেখিয়েছিল বা চাপ সৃষ্টি করেছিল।

এ ছাড়াও আমাদের আর একটি প্রস্তাব এখনও বুলে আছে— সেটি শান্তিনিকেতনকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সর্ধশতবর্ষের আগে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে ইউনেস্কোর কাছে আবেদন করা হয়েছিল এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নথিভুক্ত করার জন্যে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থ ও রেলমন্ত্রীরা যত সমর্থন দিয়েছিলেন, তার সিকিভাগও তদানীন্তন রাজ্য সরকার দেখায়নি। একটি সঙ্গত প্রশ্ন ছিল, এই এলাকার দায়িত্বে কে আছে— বিশ্বভারতী, রাজ্য সরকার, বোলপুর পুরসভা না কি শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন সংস্থা? আরও কয়েকটি বিষয় নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু তার পর আর বেশি কিছু এগিয়েছে বলে মনে হয় না।

আমরা এখন একটি নতুন প্রস্তাব দিতে পারি— হাওড়া ব্রিজকে কেন্দ্র করে। প্রায় ১৫টি পুরনো সেতু ইউনেস্কোর বিশ্বসম্মান পেয়েছে, আর বেশ কয়েকটি বিস্ময়কর স্থাপত্য, অট্টালিকা বা যন্ত্রবিজ্ঞানের অসামান্য নিদর্শনকে চিহ্নিত করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ

সাইটের তালিকায়। হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্র সেতু তো শুধু লোহালঙ্কড় নয়, ভারতের মানুষের কাছে একটি স্বপ্ন, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিস্ময়।

অতএব, বিশ্বের সেরা সম্মান পাওয়াও যত কঠিন, রাখাও তত কঠিন। স্পষ্ট মনে পড়ে, ২০০৯'এ ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির প্রথম সভা। এর প্রায় এক দশক আগে ইউনেস্কো এক বার এই তালিকাটি অন্য নামে চালু করেছিল। বাজপেয়ী সরকার তখন রামলীলা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ এবং কুডিয়াটাম সংস্কৃত নাটকের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান এনেছিল। কিন্তু সাত বছর পরে ভারত একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ভারতের সঙ্গীত নাটক অকাদেমি আমাদের মাত্র একটি প্রস্তাব দিতে পেরেছিল— উত্তরাখণ্ডের রাম্যাম বলে একটি মেলা যার ব্যাপারে কেউই বেশি কিছু জানত না। ওখানে গিয়ে দেখি চিন প্রচণ্ড হোমটাঙ্ক করে এসেছে আর একের পর এক প্রস্তাব পাশ করেই চলেছে।

২০১০-এ ১৫টি প্রস্তাব নিয়ে যায় ভারত। সে বছর বিশ্ব সম্মান নিয়ে আসতে পারে ছৌ নৃত্য। কেন্দ্র ও রাজ্য উঠেপড়ে লাগলে গত দশ বছরে তিরিশটি এমন সম্মান পেতে পারতাম। কিন্তু শেষ অবধি মিলেছে সাতটি, যার মধ্যে দুর্গাপূজো হল শেষটি।

তপতী গুহঠাকুরতার মতো বিশেষজ্ঞরা তাঁদের দল নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁদের নিয়ে মমতাবিরোধী রাজনীতি করা শোভা পায় না। এও মানতে হবে, গত দশ-বারো বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রচুর সাহায্য করেছে এই পূজোগুলিকে, যা আগে কোনও রাজ্য সরকার করেনি। এখন থেকে এই মহানগরীর শারদীয় উৎসবের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার দায়িত্ব শুধু সরকার বা পুলিশ-পুরসভার নয়— নাগরিকেরও, এটা যেন আমরা না ভুলি।